তথ্যচিত্র

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের গল্প

আট ফুট বাই পাঁচ ফুট ঘরটার বড়ো অংশ জুড়ে লোহার খাটটা। যেটার সাইজ পাঁচ ফুট বাই দু-ফুট। তাতে সরু তোশকের ওপর সাদা চাদর বিছোনো। মাথার কাছে পাতলা বালিশ। খাটের এককোণে সাদা টি-শার্ট আর সাদা জমিতে নীল-নীল ঘরকাটা লুঙি পরে বসে অবনী চক্রবর্তী।

অবনী উষ্চতায় বড়োজোর পাঁচ-ছয়। রোগাটে শরীর, পুরু গোঁফ, ভরাট ভুরু। চুলে ছাঁট পড়লেও অনেকখানি ফেঁপে আছে। চোখের কালো মণিদুটোয় বিভ্রান্তি আছে; সরল চোখ। কিন্তু অনর্থক কম্পন নেই দৃষ্টিতে। এই চোখে ও মাথার কাছে রাখা ছোট্ট ফ্রেমে বাঁধানো কালীর ছবি দেখে। ওর ওই নির্মেদ হাতে গোলাপি ক্রেয়নে সাদা দেয়ালে মা কালীর ছবিও এঁকেছে একটা। ঘরের সাদা দেয়ালে যিশুর ছবি দেওয়া একটা বাংলা ক্যালেণ্ডারও ঝুলছে। তাতে একেকটা দিন পার হলে ও একেকটা তারিখ পেনসিলে কেটে বাতিল করে দেয়। কারণ ওই দিনটা ওর জীবনের শেষ কয়েকটা দিনের ঝুলি থেকে ঝরে পড়ল।

যতক্ষণ না দেশের রাষ্ট্রপতির সই নিয়ে ফাঁসি রদের নির্দেশ আসছে, অবনীর পরমায়ু বলতে ক্যালেণ্ডারের ওই বাকি ক-টা দিন। খুনের দায়ে দন্ডিত আসামির জন্য প্রাণভিক্ষার আবেদন তিনমাস সাতদিন পুরোনো হয়েছে। রোজই ভোর হলে আশা জাগে আজ বুঝি সে চিঠি এল। সন্ধ্যে নামলে যখন গরাদের ফাঁক দিয়ে রাতের খাবার গলিয়ে দেওয়া হয় অবনীর জন্য, তখন সে দিনের মতো আশা নিভে যায়। তারপর আহার শেষ করে অবনী যখন বিমল মিত্রের আসামি হাজির উপন্যাসটা নিয়ে আরামে শোয় তখন গড়িয়ে যাওয়া দিনটাকে বড়ো মূল্যবান মনে হয় ওর।

যখন ঘুমে জড়িয়ে আসে মাথা, জেগে থাকা কষ্টকর, অবনী চট করে মাথার কাছে রাখা পেনসিলটা তুলে দিনটাকে ক্যালেণ্ডার থেকে বাতিল করে দেয়। যে-দিনটা গেল গেল, ক্যালেণ্ডারের বাকি তারিখগুলোর দিকে অবাক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে অবনী ভাবে—এই তা হলে আমার জীবন! মিনিট... ঘন্টা... মাস.. সবই তখন ওর কাছে একটা জিনিসই হয়ে ওঠে—-জীবন!

যেকোনো দিন চলে যেতে পারে বলেই হয়তো জীবনটাকে বড়ো মধুর বলে মনে হয় অবনীর। মাঝে-মাঝে চলে যাওয়া দিনটাকে ক্যালেণ্ডারে কাটতে গিয়ে হাতটা কেঁপেও যায়। কোনো একটা উপন্যাসে কদিন আগে পড়েছিল অবনী—চলে যাওয়া দিনের জন্য ব্যথাও নাকি ভালোবাসা।

কোন বইয়ে পড়েছিল? অবনী শুয়ে শুয়ে ওর বইগুলোর দিকে তাকায়—বিমল মিত্রের বেগম মেরী বিশ্বাস, মনোজ বসুর সেই সব গ্রাম, সেই সব মানুষ, তারাশঙ্করের না, শংকরের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ, সমরেশ বসুর গঙ্গা, শক্তিপদ রাজগুরুর মেঘে ঢাকা তারা, নীহাররঞ্জন গুপ্তের মাধবী ভিলা, জরাসন্ধের লৌহকপাট..... এই ক-মাসে কম বই তো জমেনি! কিন্তু ঠিক কোথায়, কোন বইয়ে কথাটা ছিল? নাকি কোথাও নেই কথাটা, ওটা ওর

নিজের আবিষ্কার? কেন আজকাল এমন হয় অবনীর—আগে পরের দিনগুলো সব তালগোল পাকিয়ে যায়? বহু আগের দিনগুলো বার বার মনে পড়ে আর আগামী কটা দিন কয়েকটা মুহূর্ত হয়ে বুকে এসে আছড়ে পড়ে?

অবনীর সলিটারি সেলের গরাদ দিয়ে একটা দেয়ালই শুধু দেখা যায়। সেই দেয়ালের মাথার উপরে ফুটখানেক আকাশ। ওই একচিলতে আকাশকেই ওর স্বাধীনতা বলে মনে হয় আজকাল। ওই আকাশে রোদ থাকলেও ভালো, মেঘ করলেও ভালো। বৃষ্টির কটা দিন আকাশটাকে ওর নদী বলে মনে হচ্ছিল।

এখন ঠিক ওই একমুঠো আকাশের আলোটাকে কীভাবে ছবিতে ধরে রাখা যায় তারই হিসেবনিকেশ করছিলেন ভারতবিখ্যাত চিত্রপরিচালক সত্যশিব। একবার ক্যামেরাম্যানদের দিকে তাকিয়ে একগাল সাদা দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বললেন সত্যশিব রাঠোর, ক্যাট বিট অফ স্কাই ইজ অবনী'জ ফ্রিডম ফিল্ড। উই মাস্ট ইউজ ইটস অ্যারোমা।

সাদা দেয়ালে আকাশ আর রোদের নির্মল সাঁতার, অদৃশ্য প্রতিফলন। ক্যামেরাম্যান নীরেন্দ্র সেন সেইভাবেই চাইছিলেন ছোট্ট, ন্যাড়াঘরের মুক্ত ফ্রেম। নড়া, সরা এমনকী মরার মতোও জায়গা নেই যে-ঘরে, তারই টাইট ফ্রেমে ধরা দৃশ্যে জেলখানার মৃত্যুঘোষণা।

সেই ফ্রেমে, অবনীর খাটের এক পাশে গুটিগুটি গিয়ে বসল অনির্বাণ। একমাথা উশকোখুশকো কোঁকড়া চুল আর গলা অবধি নেমে আসা দাড়িতে অনির্বাণের প্রোফাইলটা দাঁড়ায় কিছুটা ছবির যিশুখ্রিস্ট আর কিছুটা এককালের নকশাল ছেলেটির আইডল চে গুয়েভারার মতন। সে নিজেও আজ বড়ো বিপন্ন ভিতরে ভিতরে কারণ সত্যশিব ওকে সোজাসাপটা বলে দিয়েছেন, তুমি অ্যাকটিভ জার্নালিস্ট, তোমাকে আবার ব্রিফ দেব কী? মৃত্যুর

অপেক্ষায় থাকা এক মানুষের সামনে তোমার সাংবাদিক হিসেবে যা-যা প্রশ্ন তুমি তাই তাই করবে। আমার দায়িত্ব এক বাস্তব ঘটনাকে যথাসম্ভব বাস্তবভাবে তোলা! তুমি তো আমার অ্যাকটর নও, তুমি তথ্যচিত্রের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত বাস্তবের একটা অংশ। তোমাকে প্রশ্ন দিয়ে সাহায্য করা আমার কাজ নয়।

সাংবাদিকতা আর জীবন এত ঘনিষ্ঠভাবে কখনো মেলামেশা করেনি ওর জীবনে। কখনো কোনো প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে ওর এই প্রশ্ন জাগেনি মনে : আমি কী জানাতে চাই?

সত্যশিবের চাওয়াটা অবশ্য একই সঙ্গে সরল এবং জটিল। অনির্বাণকে তিনি বলেছেন, আমার তথ্যচিত্রের লক্ষ্য খুব স্পষ্ট। যে-সব ফাঁসির মামলা ঝুলে আছে সারাদেশে এমন আটটা ঘটনা নিয়ে আমি ছবি করছি। এই আটটা মামলার একটাই সাদৃশ্য : এদের সবকিছুতেই ফাঁসির হুকুম জারি হয়েছে, কিন্তু এদের কোনোটিরই অপরাধ নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হয়নি বলে ধারণা হয়েছে কারও কারও। এ ক্ষেত্রে ক্রিকেটের নিয়মে কি দোষীকে বেনিফিট অফ দ্য ডাউট দেওয়া যায় না?

অনির্বাণ প্রশ্ন করেছিল, সে তো তা হলে বিচারবিভাগের চিন্তা আর সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার শামিল হচ্ছে।

সত্যশিব একমুখ দাড়ির ফাঁক দিয়ে হেসে বলেছিলেন এগজ্যাক্টলি। আর সেটাই আমার চাওয়া ও লক্ষ্যের জটিল দিক। আমি আদালতের বিচারে প্রশ্ন তুলছি না; বস্তুত অবনী সত্যিই খুন করেছে কি করেনি সেই তদন্তেও যেতে চাইছি না। আমি শুধু মৃত্যুদন্ডের মৃত্যুদন্ড ভিক্ষা করছি বিচারবিভাগের কাছে।

চমকে উঠেছিল অনির্বাণ—তার মানে? আপনি ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট অ্যাবলিশ করতে চান? অর্থাৎ দোষীর দোষ যাই হোক তাকে মেরে ফেলা যাবে না?

সত্যশিব অনির্বাণের কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে বলেছিলেন, ইউ হ্যাভ গট মি। দ্যাট ইজ মাই টার্গেট। বিচারের দায়িত্ব, আমি বলতে চাই, শাস্তিদান ও যথাসম্ভব সংশোধন। একটি মানুষের বাঁচার অধিকার কেড়ে নেওয়ার অধিকার তার থাকা উচিত নয়।

অনির্বাণ হেসে বলেছিল, তার মানে আপনি আদালতকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন? সত্যশিবের মুখের প্রসন্নতা কেটে গেল। তিনি ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, না, এইটাই আমি করছি না। আদালত যা করবে সেটা আদালতের কাজ। আদালতের সেই কাজের পথে পাথর ছড়াচ্ছি না আমি। কিন্তু আদালতকে চলতে হয় অসংখ্য ধারাবিচার, সূত্র ও মতের ভিত্তিতে। এমনই কিছু কিছু ধারা আদালতকে মৃত্যুদন্ড বিধানের ক্ষমতা দিয়েছে। আমি সেই ক্ষমতার সামান্য সঙ্কোচন চাইছি। বলছি, মৃত্যুদন্ড দিয়ে কাউকে সংশোধনের পরপারে পাঠিয়ো না।

অনির্বাণের তখন অদম্য কৌতূহল হল জানার, স্যার, হঠাৎ এরকম এক আকাঙ্ক্ষা হল কেন আপনার?

আর তখন-তিনদিনের আলাপে এই প্রথম সত্যশিবের মুখে একটা গাঢ় ছায়া দেখল অনির্বাণ। তিনি মুখের সিগারেটটা অ্যাশট্রেয় শুইয়ে রাখতে রাখতে বললেন, হঠাৎ নয়। এই ইচ্ছে আমাকে ছ-বছর বয়স থেকে তাড়া করে আসছে। বলতে গেলে সেই দিনটা থেকে যে দিন বাবার হাত ধরে দাঁড়িয়েছিলাম লাহোরের রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে। গোরু-মোষের মতো নারী-

পুরুষকে ঠেসে দেওয়া হচ্ছিল ট্রেনের কামরায়। সবাই যাবে সদ্য ভাগ হয়ে যাওয়া ওপারের হিন্দুস্তানে। আর বৃদ্ধ পড়শি করিমচাচা এসে বাবার হাত ধরে কেঁদে পড়লেন, মনমোহন, দেশ তো ভাগ হয়ে গেল; আর তো আমি আমার পিয়ারে ননহে আক্রামকে লুধিয়ানার জেলখানায় দেখতে যেতে পারব না। তুমি কি মাঝে-মাঝে ওর খবর নিয়ে আমায় খত লিখবে?

বাবা তখন চোখ মুছতে মুছতে বললেন, আমি তো ভাইয়া জলন্ধরে গেরস্তি করব। মাস মাস তো পারব না, তবে তিনমাসে একবার গিয়ে আক্রামকে দেখে এসে তোমায় পত্র দেব।

খুদাকে বহুৎ মেহেরবানি কি তুমি যৈসি পঢ়োসি মুঝে মিলি থি—বলে চোখের জলে একাকার হয়ে করিমচাচা বাবাকে গালে চুমু খেতে লাগল। আমি ট্রেনে উঠে বাবাকে বললাম, পিতাজি, লুধিয়ানায় গেলে আপনি আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। বাবা মাথা নেড়ে বলেছিলেন, ঠিক আছে।

এরপর সত্যিই আমরা তিনমাস পর গিয়েছিলাম আক্রামকে দেখতে লুধিয়ানার। গিয়ে কী শুনলাম? তার দু-দিন আগে খুনের আসামি আক্রামের ফাঁসি হয়ে গেছে। বাবা বাড়ি ফিরে এসে প্রচুর কাঁদলেন, তারপর মিথ্যে-মিথ্যে করে একটা চিঠি লিখলেন করিমচাচাকে। লিখলেন, আক্রামের তবিয়ত ঠিক আছে। সবার খোঁজ নিয়েছে। তবে কষ্ট করে কাগজ বানিয়ে আব্বাকে হিন্দুস্তানে আসতে নিষেধ করেছে। বাবার তখন একবারও সন্দেহ হয়নি যে তার আগেই ওর ফাঁসির খবর পৌঁছে গিয়েছিল লাহোরে। করিমচাচা বাবার চিঠি পেয়ে লিখেছিল, মনমোহন, তুমি আক্রাম বলে কাকে দেখে এসেছ জানি না। আক্রাম ফাঁসির ফান্দায় গায়েব হয়ে গেল আমার জীবন থেকে। লুধিয়ানা হিন্দুস্তানে না পড়ে পাকিস্তানে পড়লে হয়তো ওকে এত কঠিন শাস্তি পেতে হত না।

শেষ বাক্যটা শুনে চমকে উঠেছিল অনির্বাণ। ওর সেই মুখবিকার দেখে সত্যশিব বললেন, তুমি অবাক হচ্ছ? এক সাধারণ মৃত্যুদন্ডেরও কী রাজনৈতিক ব্যাখ্যা হয় সে দিন প্রথম বুঝেছিলেন বাবা। সারাক্ষণ বাড়ির উঠোনে বসে একটাই কথা বলতেন তখন, ইন্তেকালসে বড়া ঝুট কুছ নহি হোতা। কিউঁকি ইয়ে জিন্দেগিকো ঝুট বনা দেতি। মৃত্যুই সেই বড়ো মিথ্যে যা জীবনকেই মিথ্যে করে দেয়। আর সেই মৃত্যুকে প্রশ্রয় দেয় মানুষের তৈরি মৃত্যু—সে খুন হোক চাই বিচারালয়ের মৃতুদন্ড। অনির্বাণ, তুমি আমার অলবিদা ছবিটা দেখেছ?

অনির্বাণ মাথা নেড়ে বোঝাল হ্যাঁ। সত্যশিব অমনি ফের শুরু করলেন, ওখানে দেশবিভাগের পাশাপাশি আমি বাবার এই সমস্যাটা নিয়েও কাজ করেছি। অনির্বাণ একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, এবার ওই ছবিটা আমার কাছে আরও একটু পরিষ্কার হল মনে হচ্ছে।

—আর আমার এই ডকুমেন্টারির উদ্দেশ্যটা? জিজ্ঞেস করলেন সত্যশিব।

—এর উদ্দেশ্যটা হয়তো আমি ছবিতে কাজ করতে করতে ধরতে পারব।

সত্যশিব সামান্য হেসে, অ্যাশট্রেতে শোয়ানো সিগারেটটা তুলে একটা লম্বা টান দিলেন— ইউ আর ওয়েলকাম।

এখন, এই মুহূর্তে, অনির্বাণ অবিশ্যি এক চরম ধন্ধে পড়ে গেছে, সেই চাওয়ার প্রশ্নে। যত সরল আর যত জটিলই হোক, সত্যশিবের চাওয়ার একটা চেহারা সে পেয়েছে। সামনে বসা দন্ডপ্রাপ্ত অবনীর চাওয়ারও একটা অনুমান সে করতে পারছে। অবনী চায় এই তথ্যচিত্র জনমত গড়ে ওকে মৃত্যুদন্ড থেকে রেহাই দিক। সরল চাহনিতে সেই উদগ্রীব আকাঙ্ক্ষার একটা ছোঁয়া দেখতে

পাচ্ছে অনির্বাণ। যে-চাহনিতে পাপ আবিষ্কার করা যায় না, সে চাহনিতে মৃত্যুভয়ই বা নেই কেন? জীবনের মায়া আর মৃত্যুভয়ের মধ্যেও কি তা হলে সূক্ষ্ম, অলক্ষ্য ব্যবধান আছে? নাকি নির্দোষ হলে এমন পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি জন্মায়? নাকি ষোলো আনা দোষী বলেই এমন নির্মম সত্যবরণ সম্ভব হয়?
কিন্তু...কিন্তু...অনির্বাণ নিজে কী চায়?

মুহূর্তের জন্য যিশুর ছবিতে চোখ পড়ে ওর প্রশ্নগুলো ফের গুলিয়ে গেল। তথ্যচিত্রের প্রশ্ন আর নিজের হৃদয়ের প্রশ্নগুলো জড়িয়ে পিটিয়ে গেল ফের। যিশুরও তো শোনা যায় বিচার হয়েছিল, মৃত্যুদন্ডও হয়েছিল। ইশকুলের ইংরেজির মাস্টার অ্যান্টনি গোমেস বলতেন না যে ক্রাইস্ট তাঁর মৃত্যু দিয়ে সমস্ত জগবাসীর পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন? তার মানে অবনীর পাপ, বা ও নিরপরাধ হলে সেই খুন হওয়া সিন্ধি পরিবারের মেয়েটির আত্মীয়বর্গের ষড়যন্ত্র কিংবা পুলিশের সাঁট অথবা ভ্রান্ত তথ্যে বিচারের বিভ্রান্ত সিদ্ধান্ত সবেরই জন্য যিশু মূল্য ধরে দিয়ে গেছেন তাঁর রক্তে?

অনির্বাণ ধার্মিক নয়, আবার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রশ্ন করে করেও এগোতে পছন্দ করে। অনুভূতি মাঝে মাঝেই ওর চিন্তাকে জয় করে নেয়। এখন যেমন নিচ্ছে। মনে হচ্ছে। চুলোয় যাক সত্যশিবের মৃত্যুদন্ড আইন রদের মহৎ লক্ষ্য, আপাতত এই সাধারণ, গরিব চেহারার মানুষটাকে ফাঁসির গেরো থেকে বাঁচাতে পারলেই হয়।

পরমুহূর্তেই একটা খটকা বাজল বুকে; এই মাল যদি হয় যোলো আনার উপর আঠারো আনা ধূর্ত? যুবতীর ধর্ষণকারী, নির্মম খুনি? নিজের ধন্ধে নিজেই চমকে গেল অনির্বাণ। আর ঠিক সেইমুহূর্তে মাথার পিছন থেকে পরিচালকের জলদগম্ভীর কণ্ঠে ভেসে এল নির্দেশ : সাউণ্ড! রোল!! অ্যাকশন!!!!

২.

আলো ঝলমলিয়ে উঠতেই অবনী একটু সামনে ঝুঁকে সরল চোখ দুটো তুলে ধরল অনির্বাণের দিকে। অবনী দক্ষিণ কলকাতায় এক মাল্টিস্টোরিড ফ্ল্যাটবাড়ির দারোয়ান ছিল। পোশাকি ভাষায় বলা হত সিকিউরিটি পার্সোনেল। দুই দারোয়ানের এক দারোয়ান সে। তার উপর সম্ভাব্য খুনি। ইংরেজি সংবাদপত্রের আইনি প্রতিবেদনে একটা প্রথা আছে অভিযুক্ত পুরুষ ও নারীর উল্লেখ করার সময় 'মিস্টার' ও 'মিস' বা 'মিসেস' জাতীয় সম্মানসূচক শব্দ পরিহার করা হয়। অবনীকেও কি তা হলে আপনি' না বলে 'তুমি' করে সম্বোধন করলে হয়?

কিন্তু প্রশ্ন করার সময় মুখ ফুটে বেরিয়ে এল 'আপনি।

—আপনার পুরো নাম?

–অবনী চক্রবর্তী।

-বয়স?

–সাতাশ।

—বিবাহিত?

—হ্যাঁ।

–কদ্দিন?

-দেড় বছর।

—এর মধ্যে তো তেরোমাসই আপনি জেলে?

—হ্যাঁ।

–তা হলে ক-দিন সংসার করতে পারলেন?

‘সংসার?’ বলে বিষণ্ণ হাসল অবনী। অভিমানের হাসি। ব্যঙ্গের হাসিও। সংসার আর কবে করলাম, স্যার? তার পরেই তো ছুটি নেই দেখে কলকাতায় এসে গেলাম। আর তারপরই

তো...অবনীর কথা ফুরিয়ে গেল।

সাময়িকভাবে প্রসঙ্গ বদলাতে অনির্বাণ জিজ্ঞেস করল, আপনি তো বাঁকুড়ার লোক? কী গ্রাম?

–খেড়োশোল।

–সেখানে কারা আছেন?

–বাবা, মা, তিন বোন...

–বোনদের কীরকম বয়স?

-সব্বাই ছোটো। একজনের সতেরো। একজনের কুড়ি। আরেকজনের বাইশ। আমিই বড়ো।

—আর স্ত্রী?

—সে চলে গেছে।

চমকে উঠে অনির্বাণ বলল, চলে গেছে? কোথায়?

–ছাতনায় এক আশ্রমে।

–কারণ?

–আমিও তো সেই কারণগুলো ভাবি।

—কী ভাবেন?

–ও হয়তো ভেবেছিল সিন্ধি মেয়েটাকে আমি সত্যি...

–ধর্ষণ করেছেন?

–হুঁ।

-খুনও করেছেন?

–জানি না। হয়তো।

—তা আপনার স্ত্রী তার স্বামীর উপর ভরসা রাখলেন না?

অবনীর ঠোঁট কাঁপছিল, স্বর অস্পষ্ট হয়ে এল। কিছুটা স্বগতোক্তির মতোই আওড়াল, কতটুকু আর চিনতে পারল আমাকে!

অনির্বাণ জিজ্ঞেস করল, আর আপনি কতটুকু চিনতেন ওঁকে? এবার একটু সপ্রতিভ হল অবনী, চিনতে তো সময় লাগে, তাই না? তবে ভালোবেসেছিলাম।

-কেন, খুনের ঘটনার পর তো পুলিশ আপনাকে আপনাদের গ্রামের বাড়ির গোয়াল থেকে অ্যারেস্ট করেছিল। তখন তো...

—তখন আর সে কোথায়? পুলিশের হাত এড়াতে যখন বাড়ি গেছি ততক্ষণে খবর পৌঁছেছে আমি খুনি। যুবতী মেয়েছেলেকে কী না কী করেছি। বউ পায়ে হেঁটে বাপের বাড়ি রঘুনাথপুর চলে গেছে। বাবা, বোনরা কেউ যায়নি সঙ্গে। দুপুরে চান সেরে, না খেয়ে, এক কাপড়ে...

–বাড়ি গিয়ে ওকে ফিরিয়ে আনার কথা ভাবেননি তখন?

–ফিরিয়ে আনব? আমি নিজেই তখন গোয়ালে খড় চাপা দিয়ে পড়ে আছি। দিন-রাতের হিসেব চলে গেছে। সারাক্ষণ গোবর আর চোনার গন্ধ শুকে এঁকে ছাতি জ্বালা করছে। হঠাৎ দমাদ্দম বাড়ি পড়তে শুনলাম দরমার বেড়ায়, তারপর গোয়ালে ভাঙচুর, তছনছ। শুনলাম একজন অফিসার হাঁকছে। শালা, বেরিয়ে আয়, নয়তো গুলি চালাব। আমি তো মানুষ; তখন গাইবাছুররাই ভয়ে ডাকছে। আমি কাঁপতে কাঁপতে উঠতেই ওরা রড মেরে সোজা করে দিল। বউকে কী আনব, স্যার? পুলিশই আমায় নিয়ে এল কলকাতায়। তারপর আর কী স্যার? আমার টাকা কোথায় যে পুলিশকে হাত করব?

-কেন, পুলিশকে হাত কেন?

—ওই পুলিশই তো সব করল?

—কীরকম?

–যা করার।

—যা করার মানে?

–ঘটনা সাজিয়ে দিল। বলি তা হলে? একটা সিগারেট খেতে পারি, স্যার? অনির্বাণ একটা ফিল্টার উইলস বাড়িয়ে দিল। অবনী নিজের বালিশের তলা থেকে একটা চারমিনারের প্যাকেট বার করে বলল, আছে স্যার। এখানে সিগারেট খেতে দেয় আমাদের। অনির্বাণ আর অবনী দুজনে দুটো সিগারেট ধরাল। অবনী ফের শুরু করল, আপনারা তো জানেনই চিঙ্কু ঝাভেরিয়া হিরের মার্চেন্ট।

অনির্বাণ মাথা নাড়ল, জানি।

—কত টাকার ব্যাবসা ওদের তা জানেন?

–দেড়-দু কোটি।

–মোটে? চল্লিশ-বেয়াল্লিশ কোটি!

—তো তার সবটাই চিঙ্কুর বাবার নয়। ভাগ ছিল আর দু-ভাইয়ের।

–আপনি এসব জানলেন কোত্থেকে?

—কোত্থেকে আর? ওদেরই মুখ থেকে। পনেরো দিন অন্তর তো ভাইরা এসে শাসাত।

-কেন?

—বলত চিঙ্কুর বাবা ধর্মদাস ওদের শেয়ার লুটে নিয়েছে। ওদের একজন বিঠলদাসের ছেলে কাঞ্চন তো সাফ বলল চিঙ্কুকে দেখিয়ে একদিন, পয়সা মেটাও, নয়তো মেয়েকে তুলে নিয়ে যাব।

—তার মানে আপনি বলছেন এটা ফ্যামিলির ব্যাপার?

–হ্যাঁ। আর তার মধ্যে ফাঁসিয়ে দিয়েছে আমাকে।

–ধরা যাক তা-ই। সে ক্ষেত্রে এটাও তো হতে পারে যে এই ভাইরা আপনাকে দিয়ে ওই কাজ করিয়েছে টাকা খাইয়ে।

—টাকা? আমার নিজের জমিটুকুও তো বিক্রি হয়ে গেছে এই মামলা লড়তে গিয়ে। আমি একমাত্র রোজগেরে লোক ফ্যামিলিতে। আজ তো বোনরা নিজেরা একবেলা খেয়ে বাবাকে দু-বার ভাত দিচ্ছে দিনে। আমার আটষটি টাকা সম্বল। পোস্ট অফিসে। জেল খাটছি বলে দু বেলা খেতে পাচ্ছি।

—আমরা অন্য কথায় চলে যাচ্ছি। অবনীবাবু, আপনি আপনার কথা বলুন।

অনির্বাণ আব অবনী একসঙ্গে সিগারেট নেভাল। দ্বিতীয়জন বলল, তা হলে আমার কথাটা মন দিয়ে শুনুন? অনির্বাণ বলল, হ্যাঁ। বলুন...।

৩.

বসুন্ধরা অ্যাপার্টমেন্টসে আমরা দু-জন সিকিউরিটির লোক। পবন মোহান্ত আর আমি। পবন উড়িষ্যার লোক, আমি বাঁকুড়ার। আটতলা বাড়িতে

বত্রিশটা ফ্ল্যাট, দুটো লিফট, ষোলোটা গাড়ি রাখার প্লেস, কিন্তু সিকিউরিটির জন্য একখানা ঘরও নেই। আমাদের মাইনে দুশো টাকা করে। ডিউটি আটঘন্টা করে। ছুটি তিনমাস কাজ করলে টানা একসপ্তাহ। সারাবছরে একমাস। বিয়ের পর তিন রাত্তিরের বেশি থাকতে পারিনি কারণ ছুটি ছিল না। চেষ্টায় ছিলাম তিনমাস টেনে দিয়ে একহপ্তা গিয়ে বাড়ি পড়ে থাকব। বউ বলেছিল, এরপর এলে তিনদিনের মাথায় ফিরতে দেব না।

যেদিন ঘটনা ঘটল সেদিন দুপুর দুটো অবধি ডিউটি চালিয়ে আমি ঘরে যাই। পবন আর আমি দুজনে ষাট টাকা করে দিয়ে বসুন্ধরার কাছেই একটা ঘর নিয়েছিলাম। ছটা-দুটোর কাজ সেরে আমি পবনের জন্য অপেক্ষায় ছিলাম, দেখি পবন আসে না। অথচ আধঘন্টা চলার জন্য আমি জলের পাম্প চালিয়ে দিয়েছি। ভাবছিলাম, কী করি। পাম্প বন্ধ করে পবনকে খুঁজতে বেরুব, না আরেকটু অপেক্ষায় থাকব।

ভবানীপুর পাড়ায় জানেনই তো জলের বেশ ক্রাইসিস। ভাবলাম জল বন্ধ করে রাখলে না জানি হাঁকডাক শুরু হয়ে যাবে বাবুদের। তখন ঠিক করলাম একটা ফ্ল্যাটের কাউকে অন্তত বলে যাই যে পাম্প চালু আছে, আমি পবনকে খুঁজতে বেরুচ্ছি মেনগেটে তালা দিয়ে। দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসছি। কিন্তু কাকে খবর দোব? দুপুর দুটোয় পুরুষরা সব কাজে বাইরে, মহিলারা ঘুমুচ্ছেন; বেল দেবার মতো একটাই ফ্ল্যাট—চিঙ্কু ঝাভেরিদের। কিন্তু সেখানেও ভয় চিঙ্কু ঝাভেরিকে নিয়ে। সে এ সময় জেগে থাকবে ঠিকই, বেল দিলে খুলবেও, কিন্তু আমায় দেখে কী মূর্তি ধারণ করবে জানি না।

এই জিভ কেটে বলছি স্যার, ওরকম মেয়ে যেচে পড়ে আমার কাছে এলেও ছোঁওয়ার বাসনা নেই। যুবতী মেয়ে, দেখতে সুন্দরী, দুধের মত রং, কিন্তু ব্যবহার? ও সহ্য করা যায় না। সারাক্ষণ মুখ দিয়ে বুলেট ছুটছে। পুজোর

সিজনে একদিন দলবল নিয়ে রাত বারোটায় এসে গাড়ির হর্ন লাগানো শুরু করল। আমি সিঁড়ির আলোয় বসে একটা গল্পের বই পড়ছিলাম। দেড়-দু মিনিট পরে খুলেছিলাম। সে কী তোড়ফোড় স্যার রাত-বিরেতে। বলে, তুমি ঘুমুচ্ছিলে। ওদের মধ্যে একটা ছেলে তো বলেই দিল, তুম শালা কিসিকো লক তোড় রহে থে। বুঝুন কথাবার্তা। নেহাত পেটের দায়ে আছি, একটা ডিগ্রি নেই দেখেই তো এই অবস্থা! চুপ করে গেলাম। এরপরও ওদের ফ্ল্যাটে হইহুল্লা চলল, রাত দুটোয় বাবুবিবিরা বিদেয় হলেন দল করে। পরদিনই আমি নতুন যে ম্যানশন উঠছে পাশের পাড়ায় সেখানে গিয়ে চাকরির খোঁজ নিলাম। শুনলাম আরও আট-দশ মাস যাবে বাড়ি শেষ হতে।

পরদিন দুপুরে পবনের কাছে আরও চমৎকার খবর পেলাম—চিঙ্কু জানিয়েছে কাকে কাকে যেন, যে আমার চাউনি-টাউনি সুবিধের না। আমি ওর শরীরকে নাকি চোখ দিয়ে চাটি। কথাটা শুনে এইসা রক্ত চড়েছিল মাথায় সেদিন যে পবনের সামনে উগরে দিই—এইসব কথাবার্তার আসল উত্তর হল ধরে রেপ করে দেওয়া। এরকম তো আমরা হামেশাই বলি, বলি না কি? পরে রেপ আর খুনের ঘটনার জেরা জবানবন্দিতে পবনকে দিয়ে এই কথাটা বলিয়ে কেস সাজাল পুলিশ। বলল, তুই তো পবনকে তোর প্ল্যানের কথা আগেই বলেছিলি। চিঙ্কুকে রেপ করবি।

এরপরও চিঙ্কুকে দেখে এড়িয়ে যাইনি; হাজার হোক ওদেরই মাইনে খাচ্ছি। শুধু একদিন খটকা লাগল, একদিন লিফটে আমায় একলা দেখে সে লিফটে উঠলই না। ভাবছেন ভয়ে? ভয় কাকে? আমাকে? ধুস! আমার সম্পর্কে বাজে কথা বলে আমার চোখের দিকে তাকাতে পারত না। আমি কিন্তু তাকাতাম, চাইতাম দেখুক আমার চোখের দিকে। ওকে গিলে খাচ্ছি কি না। সে সাহস ছিল না ওর। বাজে কথা অনেক বলা যায়, প্রমাণ করা যায় না।

এইসব ভেবেই অনেক দোনামোনার পরেও আমি তিনতলায় চিক্কদের ফ্ল্যাটে গিয়ে বেল দিলাম। দরজা খুললেন চিক্কুর মা, আমরা বলি ভাবিজি।

জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার?

বললাম পবন আসেনি। পাম্প চলছে। আমি গেট বন্ধ করে ওকে দেখে আসছি। গরম মেজাজে ভাবি বললেন, তো এ কথা আমায় বলতে এসেছ কেন? আমি কী করব?

বললাম, এইজন্য যে যদি এর মধ্যেই কেউ এসে আটকে যায় তো এক-দু মিনিট সবুর করতে বলবেন।

ভাবি ঝাঁপিয়ে উঠলেন, তার মানে তোমার জন্য আমি এখন বারান্দায় গিয়ে টহল দেব?

আমি আর কিছু না বলে পাম্প বন্ধ করে মেন গেট আটকে পবনকে খুঁজতে বেরোলাম। পথেই দেখি বাবু আসছেন, ভাবলাম যাক বাঁচা গেল। কিন্তু পবন যা শোনাল তাতে শরীরটা প্রায় কাহিল হয়ে যাওয়ার জোগাড় আমার। বলে বিষম জ্বর ধরেছে গায়ে, পায়ের উপর দাঁড়াতে পারছে না। গায়ে হাত দিয়ে দেখি ছ্যাঁকা মারছে। আমি বললাম, তুই একটু গিয়ে বোস ডিউটিতে, আমি ভাতটা খেয়ে গিয়ে তোকে রিলিফ করব। একবারটি শুধু ছাদে উঠে পাম্পটা চালু করে দে। বাকি যা করার আমি করব। ও চলে গেল। আমি ঘরে বসে বোধ হয় জীবনের শেষ ভদ্র খাওয়া খেলাম।

কতক্ষণ আর হবে? মেরেকেটে বিশ-বাইশ মিনিট। ফের ছুটে গিয়ে পবনকে বললাম, যা। আমি আছি। বেচারার মাথা তখন সামনে ঝুঁকে পড়েছে। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। নির্ঘাত ম্যালেরিয়া। বললাম, দেয়ালে ঝোলানো আমার প্যান্টের

পকেটে একটা ম্যালেরিয়ার বড়ি আছে। চাস তো খেয়ে নিস। এখন তো ডাক্তার-ফাত্তার পাবি না কোথাও। বিকেলে না হয় বার হোস।

পবন চলে গেল, আমি গেট বন্ধ করে ছাদে যাওয়ার জন্য ফ্ল্যাটে লিফটের কাছে দাঁড়িয়েছি, দেখি ভাবি নামছেন। এইসময় হপ্তায় একদিন করে উনি পুজো দিতে যান। বললেন, তুমি নাকি চলে যাচ্ছ? পবন কোথায়? বললাম, জ্বরে পড়েছে। আমাকেই চালিয়ে যেতে হবে। ভাবিজি গজর গজর শুরু করলেন, বিমারিমে গিরনা তুমলোগোকো আদত হো গিয়া। সমঝ নহি পাতে ইয়ে সব। চলো, গেট খুলা করো।

গেট খুলে ভাবিকে বার করে আর গেট লাগালাম না। পাটে পাটে লাগিয়ে হুড়কো গুঁজে ছাদে গেলাম পাম্প অফ করতে। দেখি তখনও একটু ওভারফ্লো হয়নি। বোধ হয় আরও পাঁচ-সাত মিনিট যাবে। ভাবলাম ফুল ট্যাঙ্ক করি, পবন আবার কবে আসে কে জানে!

একটা সিগারেট ধরিয়ে বসলাম। আটতলার ছাদে শীতের মরা রোদে গোটা শহরটাকে বড়ো ভালো লাগছিল স্যার। যেমন রোদে দেশে আমাদের দাওয়ায় বসে পিছনের শুশুনিয়া পাহাড় দেখে আরাম হত। খুব ভালো লাগছিল। বড় মন টনটন করছিল বউটার জন্য। আসার আগে বলেছিলাম, পরের বার তোমাকে ওই পাহাড়ের মাথায় নিয়ে বসব।

হঠাৎ খেয়াল হল ওভারফ্লো করছে। আমি পাম্প বন্ধ করলাম। ফের একবার ঘুরে দেখলাম শহরের শোভা। তারপর লিফটে এসে বেতাম টিপে দেখি কোনো লিফটেরই সাড়াশব্দ নেই। আশ্চর্য! এই অবেলায় দু-দুটো লিফট কোথায় গিয়ে রুখে গেল? ইশকুলের বাচ্চাগুলোও তো নেই যে বোতাম টিপে টিপে শুধু ওঠানামা করবে। আমি আর না দাঁড়িয়ে নামা শুরু করলাম।

সাততলায় নামলাম। লিফট নেই। ছ-তলায় নামলাম। এক ব্যাপার। পাঁচে। কোথায় লিফট! চারে ধুস! কী বলব স্যার, তিনে নামছি যখন বুকটা লাফাচ্ছে। এই বুঝি চিক্কর খপ্পরে পড়লাম। কী হচ্ছিল কী!' বলে খিচিয়েই উঠল হয়তো। গরিব মানুষের তো সবেতেই দোষ স্যার। বললেই হল, ছাদে দাঁড়িয়ে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলে!

কিন্তু তিনিও বড়ো শান্ত দেখলাম, স্যার। কিন্তু হায়, ও কী? দুটো লিফটই হাট করে খোলা। তাজ্জব ব্যাপার! এ সময়ে এসব ইয়ার্কি কে করছে? ঘুরে দেখি চিঙ্কুদের ফ্ল্যাটের দরজা হাট করে খোলা। পরিষ্কার বুঝলাম স্যার এ এক চাল মেয়েছেলেটার আমাকে অপদস্থ করার। এর সরাসরি মোকাবিলা করাই ভালো।

গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়ালাম, কিন্তু ঢুকলাম না। তিন তিনবার বেল দিলাম। কোনো সাড়াশব্দ নেই। ফের দু-বার বাজালাম, নো রিপ্লাই। তখন এক পা দু পা করে ঢুকে ঘাড় ঘুরিয়ে চিঙ্কুর ঘরের দিকে চোখ মেলে আমি পাথর হয়ে গেলাম। ভয়ানক একটা তাপ বিদ্যুতের মতো খেলে গিয়ে শরীরটা বরফ হয়ে গেল।

চিক্কর ঘরে খাটের নীচে মেয়েটি ছিন্নভিন্ন হয়ে শুয়ে আছে। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, মুখে হাতে রক্ত। পরনের হাফহাতা শার্ট আর জিনস অবশ্য পরাই আছে। একরাশ রাগ নিয়ে ঢুকেছিলাম ওর প্রতি, বেরিয়ে এলাম একরাশ কান্না নিয়ে। বুঝতে পারলাম না কী

করা কর্তব্য আমার, কাকে ডাকব, কাকে কী বলব। আমি বোবা মেরে গেছি ততক্ষণে। এক নিঃশ্বাসে ছুটলাম আমাদের ডেরার দিকে। রাস্তায় দেখলাম ভাবি পুজো সেরে ফিরছেন। ওঁকে দেখে বুকের সব দমই যেন ফুস হয়ে গেল।

ঘরে ফিরে দেখি পবন দেয়ালে পিঠ দিয়ে চৌকির উপর বসে। আমার চেহারায় কী দেখল কে জানে, তড়াক করে জমিতে নেমে পড়ে বলল, তুই ঠিক আছিস তো অবনী?

কিন্তু আমার কথা ফোটে না। বলতে চাইছি চিকু, কিন্তু চি-চি করে থেমে যাচ্ছি। পবন ধমকে বলল শেষে, চিঙ্কু তোকে অপমান করেছে?

—ন ন ন ন না! ও...ও...ও...ও ম মরে গে গেছে!

–মরে গেছে চিঙ্কু?

–খুন!

পবন তড়াক করে লাফিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। আমায় বলল, কে করল? কাঁপতে কাঁপতে বললাম, জানি না।

-জানিস না?

–না।

-ঘুমাচ্ছিলি?

–ছাদে ছিলাম।

—আওয়াজ পাসনি?

-না।

—কাউকে আসতে যেতে দেখলি?

-না।

—কাউকে সন্দেহ হয়?

–কাকে করব বল?

–তা হলে তুই গেলি।

–কেন রে?

–তার মানে তুই করলি।

–কী বলছিস পবন?

–আমি কী বলছি? পুলিশ বলবে।

–বললেই হল?

–পুলিশ বললেই তো সব হয়, জানিস না? উ শালারা কোনোদিন সত্যি বলেছে?

—তালে যাই ভাবির কাছে? দেখি?

–খবরদার না! এক্ষুনি খানিকটা রক্ত তুলে তোর গালে মাখিয়ে বলবে, তু কিয়া!

–তা হলে কী করব আমি পবনা?

—জামাকাপড় নে, টাকাকড়ি নে, এই নে তোর বাক্স আর যেখানে খুশি ভেগে যা। হারিয়ে যা। আর ফিরে আসিস না। তুই আমি তো গরিব রে শালা, আমাদের পালিয়ে পালিয়ে বাঁচতে হয়। বড়োলোক হলে পুলিশের থানায় গিয়ে বসে থাকতিস।

যখন সব নিয়েটিয়ে বেরিয়ে আসছি পবন হঠাৎ হাত চেপে ধরল, অবনী, একটা কথা বলবি মাইরি?

–কী কথা বল?

-তুই করিসনি তো?

–মা কী কসম পবনা। কিন্তু কেন বললি একথা?

-কী জানি, কেমন একটা ভয় করত। তোর এত রাগ, মাথা গরম, সত্যিই হয়তো চিঙ্কুকে একদিন ধর্ষণ করে ফেলবি।

—আর খুনও করে দোব, তাই তো?

–না না না না। এ আমি কী বলছি! তুই পালা।

–আর তুই?

—কী জানি কী পিটানি আছে পুলিশের।

—যদি আসল খুনি ধরা পড়ে তো আমায় খবর দিবি তো?

–কোথায় দেব?

—বাড়িতেই দিস। এখনও তো জানি না কোথায় গিয়ে ঠেকব?

—সে ভয় নেই, অবন। ধরা পড়লে তুই-ই পড়বি, বড়োলোকরা আবার কবে ধরা পড়ে? তুই এখন ভাগ এখান থেকে–

পবন আমাকে জোর করে একধাক্কায় রাস্তায় নামিয়ে দিল। আমার তখন ডাইনে-বাঁয়ে গুলিয়ে গেছে। চৌরঙ্গির দিকে যাব বলে বেরিয়ে হাঁটতে লাগলাম কালীঘাটের দিকে।

৪.

শ্যুটিং ব্রেকে বাইরে এসে দাঁড়াল অনির্বাণ। ওদের বার করে দিয়ে ফের গরাদে তালা ঝুলিয়ে দিল গার্ড এসে। অনির্বাণ দেখল পর পর তিনটে সলিটারি সেল, তাতে তিন বন্দি মৃত্যুর ঘণ্টার জন্য অপেক্ষা করছে। বাকি দু-জন জুলজুল করে দেখছে তৃতীয় সেলের ভিজিটারদের যাতায়াত। ওদের মধ্যে একজনের বিহ্বল দৃষ্টি দেখে অনির্বাণের ছেলেবেলায় দেখা একটা বাংলা ছবির দৃশ্য মনে পড়ল।

জরাসন্ধের লৌহকপাট উপন্যাস অবলম্বনে তপন সিংহের ছবি। তাতে একজন কয়েদির আত্মহত্যায় পাগলা ঘন্টি বেজে উঠেছে জেলখানাময়। তখন বৃদ্ধ আরেক কয়েদি সম্ভবত ছবি বিশ্বাসের রোলটাই, গরাদ ধরে বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবছে, আবার কী সর্বনাশ হল কোথায়? ভাবছে অবাক হচ্ছে। মন খারাপ হচ্ছে, তারপর অকারণ হাসতে লেগেছে শেষে।

অনির্বাণের পিঠে হাত রাখলেন সত্যশিব, লুক হিয়র মাই বয়, অবনীর ভার্সান একটা আমরা পেয়েছি। টু অর ফলস। এখন তুমি সরাসরি ইন্টেরোগেশনে যাও।

—কিন্তু স্যার, আমি তো আদালত নই?

এবার অনির্বাণের পিঠটা সামনে দাবালেন সত্যশিব, আরে ভাই, হোয়ট ইজ আ কোর্ট আফটার অল? কমন সেন্স, কালেক্টিভ ইন্টেলিজেন্স, সোশ্যাল উইজডম, নয় কি?

–এক-শো বার।

–তা হলে সেই সম্মিলিত শুভবুদ্ধির সঙ্গে ওকে ইন্টার‍্যাক্ট করতে দাও। একটা সংলাপ চলুক। জনগণ দেখুক লোকটাকে কতখানি অপরাধী ঠাওরানো যায়। ওর বাঁচা উচিত কি অনুচিত।

-তা হলে ওকে কী জিজ্ঞেস করব?

—সে আমি জানি না। তুমি সাংবাদিক, সেসব তুমি ভাবো।

অনির্বাণ চিন্তিত মুখে প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলল, দেখি!

ব্রেক শেষে অবনীর ঘরে ঢুকে অনির্বাণের মনে হল লোকটা সেই সকালের প্রথম দর্শনের মানুষটাই হয়ে পড়েছে। সেই সরল, গোবেচারা চাহনি। তাতে প্রাণ ভিক্ষার আর্তি আছে কিন্তু প্রাণ হারানোর ভয় নেই। সাধারণ মানুষের মতো ওর নিজেরও যেন একটা কৌতূহল আছে নিজের সম্পর্কে। কিংবা ওই খুনটা সম্পর্কে, যদি সেটা ও নিজে না করে থাকে। করে থাকলেও কৌতূহল

মেটেনি; ও বুঝে পাচ্ছে না পুলিশ, আদালত, নারী সংগঠনগুলো কেন ভাবতেই চাইছে না ও খুন নাও করে থাকতে পারে তো! একটা লোক যখন পৃথিবীর সমস্ত অভিযোগের মুখেও অবিরত বলে আসতে পারল, আমি খুন করিনি!

সত্যশিব 'অ্যাকশন!' কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই অনির্বাণ প্রশ্ন করল, অবনীবাবু, আপনি কি খুন করেছেন?

স্পষ্ট জবাব এল অবনীর, না!

–কেন বলছেন না?

–করিনি বলে স্যার।

—কোনো খুনি কি কখনো খুন করে বলে করেছি?

—আমি তো খুনি নই! এই স্পষ্ট উচ্চারণে অনির্বাণ মনে মনে তারিফের স্বরে বলল, বিউটিফুল! মুখে বলল, তা হলে আপনি কী?

—পরিস্থিতির ফেরে পড়া এক গরিব চাকুরে।

–আপনার এ সবের থেকে রেহাই পেতে কখনো মরে যেতে ইচ্ছে করেনি?

–করেছে।

–কখন?

—যখন শুনেছি চন্দনার পেটে আমার ছেলেকে আমার নয় বলে কুৎসা করেছে।

মুহূর্তের মধ্যে অনির্বাণের গলা ঠাণ্ডা মেরে গেল। অবান্তর কাশি এল। সত্যশিব নির্দেশ দিলেন 'স্টপ'! কাজ বন্ধ হল সাময়িক। অবনী মিনতি করল, একটা সিগারেট খাই, স্যার? অনির্বাণ বলল, প্লিজ! আর আপনারই একটা চারমিনার আমায় দিন। একটা কড়া ফ্লেভার চাই। অবনী ওকে একটা চারমিনার দিয়ে আরেকটা বাড়াল সত্যশিবের দিকে। সত্যশিব ততক্ষণে ওঁর ক্ল্যাসিকটা ধরিয়ে ফেলেছেন। বললেন থ্যাঙ্কস!

ফের 'লাইটস!' 'সাউণ্ড!', 'রোল!', 'অ্যাকশন! হল এক প্রস্ত। অনির্বাণ জিজ্ঞেস করল, আপনার ছেলেটা যে আপনার নয় এটা রটল কেন? অবনী বলল, কারণ বিয়ের পরের ওই তিনদিন ছাড়া আমি তো থাকিনি ওর সঙ্গে।

—তাতে কী হল?

—গ্রামের মূর্খ লোকদের মধ্যে যা হয়। ওদের মধ্যে অনেক বউই তো সারাজীবন হত্যে দিয়েও বাঁজা থেকে যায়। তারাই করে এসব।

—তা হলে আপনি মানেন যে ছেলে আপনার?

—নিশ্চয়ই! বাবা তো ছেলেকে এনে দেখিয়েও গেছেন জেলে।

–বাজে কথা রটার আর কারণ?

—আমার কেসের কথা শুনে বউ যে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

-তারপর?

-তারপর কুৎসামন্দ শুনে বাপের বাড়ি ছেড়ে ও আশ্রমে চলে গেল।

—এটাই তা হলে সব চেয়ে বড়ো কষ্ট আপনার জীবনে?

-না।

–বড়ো কষ্টটা কী, অবনীবাবু?

–বড়ো কষ্ট হল...

অবনীর চোখই প্রথম ছলছল করে উঠল।

...বড় কষ্ট হল বউও ভাবে আমি চিঙ্কুকে ধর্ষণ করেছি।

-কোথায় জানলেন সেটা?

–বোন মিনতিকে বলেছিল চলে যাওয়ার দিন।

–কেন বলেছিল বলে মনে হয়?

এবার সর্বপ্রথম লজ্জাও পেল মনে হল অবনী। ফুক ফুক করে সিগারেটে টান দিল দুটো। অনির্বাণ ফের জিজ্ঞেস করল, কেন মনে হয় ওকথা ও বলেছিল?

—কারণ ওই তিনদিনে ওর ধারণা হয়েছিল আমার দেহের খিদে বড্ড বেশি।

অবনী ওর সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে ছুড়ে ফেলল গরাদের বাইরে।

অনির্বাণ বলল, আপনার খুব বাঁচতে ইচ্ছে করে?

অবনী হাসল, কার না ইচ্ছে করে, স্যার?

অনির্বাণ বলল, ধরুন যদি আদালত বলে যে দোষ স্বীকার করলে মৃত্যুদন্ড রেয়াত হবে; করবেন?

খুব দৃঢ়ভাবে অবনী বলল, না, পারব না।

-কেন, এই যে বললেন খুব বাঁচতে ইচ্ছে করে।

-তাই বলে যা করিনি তাই স্বীকার করতে হবে? আমি বাঁচতে চাই, আমি গরিব, আমার পরিবারের আমাকে প্রয়োজন আছে, সব মানছি। কিন্তু আমি তো মানুষ!

অনির্বাণ ফের কথা হারিয়ে ফেলে হাসল। অবনী বলতে থাকল, আপনি কি জানেন প্রায় এই প্রস্তাব ওরা আমায় দিয়েছিল? আমাকে পুলিশ, আমার উকিলকে ওদের উকিল।

-কিন্তু আপনি মানেননি?

—এটা মানা যায় না, স্যার। জানেনই তো কোনো বোলোকের বাড়ির পুত্রবধূ খুন হল; টাকা খাইয়ে মৃত্যুদন্ড কমিয়ে যাবজ্জীবন হল। আমার বেলায় বড়োলোক কাউকে বাঁচাতে আমাকে মুরগি করা হল।

-আপনি কার কথা বলছেন?

—চিঙ্কুদের আত্মীয়ই কেউ হবে। হয়তো খুড়তুতো ভাই কেউ।

–কেন ভাবছেন সেটা?

— না হলে মা, মানে ভাবিজি, বাড়িতে ওদের রেখে চলে যায়?

–কী করে জানলেন তখন ঘরে কেউ ছিল?

–না হলে বেরুল কী করে?

–ওদের বক্তব্য আপনিই কাজ সেরে ভেগেছেন।

-বটে? তা হলে আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে খুন হল, ভাবি তক্ষুনি ফোন করলেন চিঙ্কুর বাবাকে অফিসে। সেখানে ওর নিজের দুই ভাইও হাজির। অথচ ওঁরা বাড়ি ফিরলেন পুরোদিনের ব্যাবসা চুকিয়ে সন্ধে আটটায়। এটা জানেন কি?

-জানি, কোর্ট প্রোসিডিংসে তেমনটাই দেখেছি।

–দেখুন স্যার, একটা কথা বলব?

—নিশ্চয়ই! আপনার কথা শুনতেই তো আসা।

—ওরা হিরের ব্যাবসা করতে পারে, কিন্তু ওদের ভিতরটা কয়লার চেয়েও কালো।

—আর পুলিশও বলতে চান..?

—পুলিশকে নিয়ে তো আমি কিছুই বলতে চাই না। চিঙ্কুর দেহে পাওয়া শুক্র আর আমার শরীরের শুক্র মিলল না বলে বলল বেশি দেরিতে টেস্ট হলে

ফল ধরে না।

–সেটা তো মেডিক্যালি ঠিকই।

–কেন, সন্দেহভাজন খুড়তুতো ভাইদের শরীরের শুক্র তো তখনই পরীক্ষা করা যেত। করেছে কি?

—ওরা তো কেউ সন্দেহের তালিকাতেই ছিল না।

—থাকবে কেন স্যার? সারাসন্ধে বসে তো সেটাই রফা হল নিজেদের মধ্যে। ওরা যাকে বলে 'জাতি মামলা', নিজেদের সমস্যা, সেটা অফিসে বসে মেটানো হল। বলি হলাম আমি। পুলিশ, আদালত, নারী সংগঠন কেউই তো আমার কথায় কান দিল না। কেউ জানল না আমার রিটায়ার করা বুড়ো বাপটার কী হাল হল। আমার বোনদের জন্মের মতো বিয়ে কেটে গেল। মা হার্টের রুগি, ফিটের ব্যামোয় পড়ল। শুধু আমি ঠিক ঠিক টিকে রইলাম নিজের পায়ে হেঁটে ফাঁসি ঘরে যাব বলে। তাই না? এত কিছুর পর একটা জঘন্য মিথ্যে স্বীকার করে নিয়ে বাঁচতে হবে তা হলে?

—শেষ অবধি রাষ্ট্রপতির ক্ষমা না এলে কী করবেন?

–তাই বা কী করে বলি বলুন। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণই তো আশ।

-আপনি এখনও তা হলে বাঁচার আশ দেখেন?

অবনী চুপ করে মাথা নীচু করে বসে রইল। সত্যশিবের ধারণা হল অনির্বাণের প্রশ্ন আর অবনীর উত্তর সব ফুরিয়ে গেছে। তিনি প্যাকআপ অর্ডার দেবেন বলে সময় গুনছিলেন। হঠাৎ মাথা তুলে সেই সরল, নির্ভয় দৃষ্টি হেনে অবনী বলল, কত জন্তু, কত কীটপতঙ্গ। সেখানে একটা সামান্য মানুষের বাঁচার জায়গা হয় না?

অনির্বাণ বলল, সেই প্রশ্নটাই তো আজ আমরা তুলতে চাইছি জগতের সামনে। আপনি দোষী কি নির্দোষ আমরা জানি না। আমি অন্তত জানতেও চাই না। কিন্তু আমরা চাই না আপনার বাঁচার অধিকারটুকু কেউ কেড়ে নিক।

৫.

সূর্য ঢলে পড়েছে শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে। শীতের গোধূলিতে দৃশ্যটা একটা ছবির চেহারা নিয়েছে। দুটো ভাঙাচোরা মোড়ায় বসে সত্যশিব আর অনির্বাণ সারাদিনের কাজের কথা ভাবছিল।

অদূরে একটা গাছে হেলান গিয়ে বসেছিলেন ক্যামেরাম্যান নীরেন্দ্র সেন, তাঁর গা ঘেঁষে স্টিল ফটোগ্রাফার সৌম্য ঘোষ। দুটো দিনই বড় হ্যাপা গেছে নীরেন্দু আর সৌম্যর। গতকাল তো কোনো মতে ঢিল আর পাথরের বৃষ্টি থেকে বাঁচানো গেছে ক্যামেরাটা। একটা ঢিল সাঁ করে এসে জমেছিল নীরেন্দুর চশমার ডাঁটিতে। তখন কী হচ্ছে কী! আপনারা কি পশু হয়ে গেলেন?’ বলে অবনীদের ভিটের দিকে তেড়ে গেছিলেন দশাসই সৌম্য।

তাতে কাজ হয়েছিল। অবনীর বোনেদের বোধহয় সংবিৎ ফিরল। এতক্ষণ ভূতে পাওয়া তিন ভৈরবীর মততা ওরা মাটির থেকে পাথর কুড়োচ্ছিল আর শুটিংয়ের দলটির দিকে ছুড়ছিল। সৌম্যকে ধেয়ে আসতে দেখে একটু ক্ষান্তি দিল। ক্রমে সৌম্য গতি সামলে নিয়ে প্রথমে থামলেন, পরে একটু একটু করে হেঁটে কুয়োটার ধারে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, আমরা আপনাদের ভাইয়ের প্রাণ বাঁচানোর জন্য লড়ছি আর আপনারা এসব কী করছেন?

বোনদের মধ্যে থেকে মিনতি এগিয়ে গিয়ে বলল, আমাদের অনেক উপকার করেছেন আপনারা। আর উপকারে কাজ নেই। আপনারা আসুন। আমাদের কথা বলা বারণ।

সৌম্য ছাড়ার পাত্র নন–কাদের বারণ? মিনতি দর দর করে ঘামছিল, তাই আঁচল দিয়ে মুখ মোছা শুরু করল। সৌম্য ফের জিজ্ঞেস করলেন, কার বারণ?

—চ্যাঁচাতে পারছি না। কাছে আসুন। সৌম্য কুয়োতলা ছেড়ে মিনতির দিকে এগোলেন। মিনতি বলল, প্রতিবেশীদের বারণ?

সৌম্য চমকে উঠে হেসে ফেললেন। প্রতিবেশী? প্রতিবেশী কোথায়? তিন মাইলের মধ্যে তো আরেকখানা বাড়িও নেই!

মিনতি বলল, খেড়োশোলে এইরকম ছাড়া ছাড়া করে বাড়ি বসে।

-তা হলে বারণটা কে করলে? মিনতি ধপ করে একটা পাথরের উপর বসে পড়ে বলল, পার্টির বারণ।

সৌম্য বললেন, ও তাই বলুন! গতকাল এই ঘটনার পর সত্যশিব ইউনিট নিয়ে ফিরে গেছিলেন দুর্গাপুর। তারপর ফোন লাগালেন তথ্যমন্ত্রীকে, স্যার, ভালো ছবির জন্য এত করছে আপনাদের সরকার, আর আমার এই ডকুমেন্টারির জন্য ক-টা ইনটারভিউ পাওয়া যাবে না? এখানে শুনেছি দলের বারণ।

মন্ত্রী জটিল সমস্যার মধ্যে সৌজন্যবোধ বা ধৈর্য হারাননি। তিনি আবার সত্যশিবের চলচ্চিত্রকর্মের একনিষ্ঠ ভক্ত। তিনি বললেন, আপনারা কাল ফের একটা ট্রিপ করুন। আমি এর মধ্যে যা করার করছি। ফোন নামিয়ে

সত্যশিব বলেছিলেন অনির্বাণকে, মনে হচ্ছে কাজটা কাল হবে। তবে কতটা কী জানা যাবে আই ডোন্ট নো।

আর আজ সারাদিনের শুটিং সেরে গোধূলির আলোয় সত্যশিব আর অনির্বাণ ভাবতে বসেছে। শেষ অবধি সত্যিই কী জানা গেল!

অনির্বাণ বলল, এটুকু জানলাম যে অবনীর পরিবার বাস্তবিকই একঘরে হয়ে গেল খেড়োশোলে।

সত্যশিব বললেন, মেয়েগুলোর কালকের হিংস্র আক্রমণ যতখানি ভাইকে বাঁচানোর ততখানিই অভিমান ও আক্রোশে। ওরা জেনে গেছে ওদের আর বিয়ে হওয়া কপালে নেই।

-খুন সম্পর্কে ওদের কৌতূহলের বেশ অভাব দেখলাম মনে হচ্ছে?

—এটা আমারও মনে হয়েছে, অনির্বাণ।

–তার কারণ?

–ওদের বোধ হয় একটা ছোট্ট যুক্তি আছে ভিতরে-ভিতরে।

–কীরকম?

—ওদের দাদা খুন করে থাকলেও সেটা সে নিজের কারণে করেনি। কেউ না কেউ ওকে দিয়ে করিয়েছে।

অনির্বাণ এই ব্যাখ্যাটায় কিঞ্চিৎ অবাকই হল যেন। দাদা যেখানে ক্রমাগত বলে আসছে। সে খুন করেনি সেখানে বোনেরা কোন আক্কেলে ভাবতে বসবে সে করলেও করে থাকতে পারে? ও বলল, তার মানে, স্যার, আপনি বলতে চান বোনদের মনে দাদার খুন নিয়ে সন্দেহ আছে?

সত্যশিব বললেন, না মোটেও তা বলছি না। ওরা বিশ্বাস করতে চায় তাদের দাদা খুন করেনি। কিন্তু ওদের এই শঙ্কাও আছে যে সমাজে সারাক্ষণ বহু কিছুই মানুষের ইচ্ছের বিরুদ্ধে ঘটে। খুব সাধারণ স্তরে এমন ঘটনা হল ওদের বউদিকে নিয়ে কেচ্ছা। খুব জটিল স্তরে এমন ঘটনা হল হঠাৎ এক সকালে খবর পাওয়া যে দাদা একজন সুন্দরী যুবতীকে খুন করে পালিয়ে এসেছে। কোনো কাজটাই হয়তো বউদি বা দাদার অপকর্ম নয়। কিন্তু হয়েছে। সারাক্ষণই এসবই ওদের জীবনে হয়, হতেই তাকে। এগুলোর ব্যাখ্যা ওরা জানে না, এসব নিয়ে গভীর কৌতূহলও ওদের কোনোদিনই গড়ে ওঠে না।

অনির্বাণ প্রশ্ন করল, আপনি বলছেন ওরা জানতেও চায় না ওদের দাদা এই খুনটা করেছে কি করেনি?

সত্যশিব এবার একটা অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে বললেন, যেন তথ্যচিত্রের ন্যারেশন লাইন পড়ছেন —দুঃস্থ। হতদরিদ্র মানুষের খুব বেশি সত্য জানার আগ্রহ বা অভ্যেস থাকে না, অনির্বাণ। সত্যের উলটো দিকে মিথ্যে, মিথ্যের বিপরীতে সত্য। অর্থাৎ সত্য বা মিথ্যের দুটো দিক, পক্ষ আর বিপক্ষ। মিনতিদের শুধু একটাই পক্ষ—দাদার পক্ষ। দাদাকে বাঁচাতে হবে, না হলে ওরা নিজেরাও মরে যাবে। সেখানে দাদা খুনি কি খুনি নয়, এই কৌতূহলের বিলাস ওদের থাকতে পারে না।

অনির্বাণ বলল, সত্যমিথ্যার কৌতূহলও কি তা হলে একটা ক্লাস প্রিভিলেজ, শ্রেণি সুবিধা স্যার?

সত্যশিব বললেন, অতখানি সরলীকরণ করা বুঝি ঠিক নয়, অনির্বাণ। তবে হ্যাঁ, যখন দেখি বর্তমান পুলিশি ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থায় ন্যায়বিচার পেতে কী পরিমাণ কাঠখড়, টাকাপয়সা পোড়াতে হয় তখন তো মনে হয়ই সত্যের মুখ শুধু হিরন্ময় পাত্রের দ্বারা অবগুন্ঠিত নয়, শুধু সূর্যের প্রখরতায় ঢাকা নয়, সোনার টাকার দ্বারাও আড়াল। তুমি তো কুরোসাওয়ার 'রশোমন' দেখেছ; বলো তো একই ঘটনার কত বিচিত্র বয়ান, ভার্শান। টাকা ওড়ালে এই ভার্শানগুলো হাজার হাজার গুণ বেড়ে যায়। নয় কি?

অনির্বাণ মাথা নেড়ে বলল, রাইট!

সূর্য পাহাড়ের পিছনে ঢলে পড়েছিল, আর ঝপ করে প্রায় একই সঙ্গে অন্ধকার আর শীত পড়ল। অনির্বাণ ফের তাকাল রুখু প্রান্তরের মধ্যে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকা অবনীদের ভিটেটার দিকে। বুড়ো বাপ, মা, বোনেরা সব ঢুকে পড়েছে খড়ের ছাউনির ঘরে, কিন্তু একটাও পিদিম, হ্যারিকেন বা কুপি জ্বলে ওঠেনি। একটা নেড়ি কুকুর ছোঁক ছোঁক করছে ফেলা ছড়ানো খাবারের টুকরোর জন্য। অবনীর ছোটোবোন জয়াকে যে টিফিনকেকটা দিয়েছিলেন নীরেন্দু সেটা অবহেলায় পড়ে আছে রিফ্লেক্টরের পাশে। মোড়কটাও ছাড়ায়নি জয়া। কেকটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল অনির্বাণকে, দাদাকে কীরকম দেখলেন সেলে? তারপর যেন আপন মনেই বলল আবছাভাবে হেসে, একেক দিন রাতে মনে হয় দাদা এসে কড়া নেড়ে ডাকছে, জয়া! জয়া! দোর খোল। আমি এসেছি।

অন্ধকার আরও ঘন হতে অবনীদের ভিটেটাকে মনে হল ভূতে পাওয়া। অবনীর ভূতে পাওয়া। ফাঁসির ঝুলে থাকা আসামিও নিশ্চয়ই ভূত হয়, ওরা তো জীবন-মৃত্যুর মধ্যেকার সত্তা। ভূতও তো প্রায় তাই, না জীবনের, না পুরোপুরি মৃত্যুর। এই সবই ভাবতে ভাবতে নিজের মনে কখন অনির্বাণ আবৃত্তি করা শুরু করল ওর প্রিয় কবির এক প্রিয় কবিতা থেকে–

দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া,
কেবলই শুনি রাতের কড়া নাড়া,
অবনী, বাড়ি আছ?

৬.

দু-দুটো বছর কেটে গেল ফিলমের কয়েকটা রিলের মতো। সত্যশিবের ডকুমেন্টারি শেষ হল না। দূরদর্শনে দেখানোর সুযোগ করে দেয় এমন একটা স্পনসরও জুটল না। ভদ্রলোকের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নিঃশেষ হয়েছে খান চারেক এপিসোড তুলতেই। মৃত্যুদন্ড রদের পক্ষে কোনো সওয়ালই করা গেল না টিভির পর্দায়। পরিচালক কিছুতেই আর ফিরে যেতে পারছেন না ফিচার ছবিতে। মাস্ট হি ডাই?' তথ্যচিত্রের জন্য যে দেশজোড়া চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল এক সময় এখন তার সবটুকুকেই ফাঁকা বুলি আর পরিহাস বলে জ্ঞান হয় ওঁর।

পার্ক সার্কাসে যে-ফ্ল্যাটে বসে কথা হচ্ছিল সত্যশিব আর অনির্বাণের তার জানলা দিয়ে দূরে চার নম্বর পোলটা চোখে পড়ে। গাড়ির হেডলাইট আর টেল লাইটের মেলা যেন। আর তার পিছনে ঘন নীল অন্ধকার।

সত্যশিবের ঘরটাও প্রায় অন্ধকার; একটা ঘাড় গোঁজা টেবল ল্যাম্পের দাক্ষিণ্যে যেটুকু যা আলো সেখানে। বন্ধু অধ্যাপক অরুণ সেনের এই ফ্ল্যাটে

তিনি এই প্রথমবারের মতো অতিথি নন, কিন্তু এইবারই তিনি প্রথম এর সান্ধ্য পরিবেশটা উপভোগ করছেন। ঘরের আলো নিভিয়ে রাখলে বাইরের অন্ধকারটা বড়ো অদ্ভুতভাবে একে ঘিরে রাখে, জাপটে ধরে। অরুণের স্ত্রী নিয়তি সেও অধ্যাপিকা—সেদিন অভিযোগ করেছিল তাদের ম্যানশনটার এক ভৌতিক আবহ আছে। আসলে কবরস্থান উচ্ছেদ করে রেসিডেনশিয়াল কমপ্লেক্স হয়েছে তো! অনেকদিনই সন্ধের অন্ধকারে একা একা লিফটে চড়তে গিয়ে বুকের ভিতরটা ছাৎ করে ওঠে। কখনো কখনো অনুভূতি হয় লিফটে অন্য একজনও উপস্থিত আছে যেন। শুধু দেখা দিচ্ছে না।

সত্যশিব নিজের আর অনির্বাণের গেলাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে বললেন, ‘মাস্ট হি ডাই? তুলতে গিয়ে একটা শিক্ষাই হল আমার; শিক্ষা না বোধ যাই বল যে, সিনেমায় সারাক্ষণ যে বস্তুটিকে বর্জন করে করে, খন্ড করে, ধ্বংস করে করে এগোতে হয় তা হল বাস্তবতা, সত্য—রিয়্যালিটি।

সে কী! একথা কেন বলছেন স্যার? কাতরোক্তি করল অনির্বাণ। আবছা অন্ধকারে আর সিগারেটের ধোঁয়ায় স্পষ্ট নজরও করতে পারল না বহুপ্রশংসিত, বহুপুরস্কৃত, নিত্য আলোচিত চলচ্চিত্রকারের মায়াময় চোখ দুটো। সেখানে কি ক্ষোভ এখন? নাকি হতাশা? নাকি কান্না?

সত্যশিব বললেন, তুমি গল্প বানিয়ে বাস্তবের ভণিতা করে সিনেমা কর, লোকে বলবে ‘দুর্ধর্ষ! একেবারে জীবন থেকে নেওয়া। আর তুমি সরাসরি বাস্তবের সামনে ক্যামেরা বসাও, লোকে তাকে তথ্যচিত্র বলায় হাজার আপত্তি তুলবে। বলবে ডিস্টর্শন অফ রিয়্যালিটি। সত্যের বিকৃতি।

—তবে বাস্তবকেও তো গুছিয়ে দেখানো চাই সিনেমায়?

-কে স্থির করবে কতটা গোছানো দরকার, কোনটা গোছানো প্রয়োজন, কীভাবে গোছানো হয়। অথচ বাস্তব একটাই। কেবল প্রেক্ষিত অসংখ্য।

—সে তো 'রশোমন' দেখে বোঝা গেছিল।

—কিন্তু কুরোসাওয়া সেখানে একটা বাড়তি সুযোগ নিয়েছিলেন, যে সুযোগ আমাদের নেই।

—কোন সুযোগের কথা বলছেন, আপনি?

— কেন, প্ল্যানচেটের মাধ্যমে খুন হওয়া মেয়েটির আত্মা নামানো। তার স্মৃতিতে তার নিজের খুন! আমরা তো বাস্তবে আর চিঙ্কুকে পাচ্ছি না।

অনির্বাণ হেসে উঠল হাঃ! হাঃ! হাঃ করে। হাসতে লাগলেন সত্যশিবও। অনির্বাণ বলল, আমরা কিন্তু ডেড ম্যান ওয়াকিং' ছবির রাস্তায় যেতে পারি। সত্যশিব বললেন, কীরকম?

–আমরা কোনো সন্ন্যাসিনীকে নিয়োগ করতে পারি অবনীর কাছাকাছি হয়ে ওর নিজের সত্যটুকু অন্তত কবুল করিয়ে নিতে।

—সেও তো এক ধরনের মেলোড্রামা, অনির্বাণ। কী প্রমাণ হয় যদি ও কবুলই করে ও খুন করেছে? বড়োজোর এটুকুই যে ও এক ধর্ষণকারী খুনে। তাতে পুলিশের অত্যাচার, বিচার বিভাগের উদাসীনতা বা নৃশংসতা, মৃত্যুদন্ডের বীভৎসতার কিছুই হেরফের হয় না। হেরফের হয় না এই সামান্য সত্যেরও যে মোটা পয়সা নিয়ে মামলা লড়তে পারলে ন্যায়কেও নিজের পক্ষে টানা যায়। আফটার অল, হোয়ট ইজ লিগ্যাল আগুমেন্ট অ্যাবাউট? ইট ইজ

অ্যাবাউট লজিক, নট টুথ। আদালতের তর্ক তো লজিক, বুদ্ধির ব্যাপার; কদাচিৎ সত্যের ব্যাপার। কালো কেন কালো বা সাদা কেন সাদা এর কি সত্যিই কোনো প্রমাণ আছে? কাজেই অবনীর অপরাধ একটা উদাহরণ মাত্র, যা তথ্যচিত্রে তুলে ধরতে গিয়ে আমি বাস্তবের নানা মুখোশ, নানা ভড়ং, নানা দৌরাত্মের চেহারা দেখলাম। অবনী বা ওর মতো মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্তরা, আমি দেখলাম, কতকগুলো প্রতীক মাত্র। ওদের মৃত্যু দিয়ে অনেক কিছুকেই বাঁচিয়ে রাখতে হয়, যেমন সরাসরি বাস্তবকে মেরে বাঁচাতে হয় সিনেমাকে। তোমার মতো আমিও পরিচালক জঁলুক গোদারের ভক্ত, কিন্তু এখন আর আমি মানতে পারি না ওঁর সিনেমার সংজ্ঞা–

Cinema is the reality 24 times a second.

—সিনেমা তা হলে কী?

–আমি জানি না। হয়তো বাস্তবের ভূত, কল্পনার রক্তমাংস। অনির্বাণ ওর পকেট থেকে আস্তে আস্তে চার হাজার টাকার একটা চেক বার করে সত্যশিবকে দিল। পরিচালক জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী অনির্বাণ?

—আপনার দেওয়া সেই চেকটা ভাঙাইনি।

–তো ফেরত দিচ্ছ কেন?

—আপনার ছবিই হল না, অত টাকা জলের মতো বয়ে গেল, কী করে ওই টাকা নিই স্যার?

-এত বেশি বিবেক দংশনের কী আছে, অনির্বাণ? যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে মৃত্যুদন্ডের

বিরুদ্ধে ছবি করতে নামলাম তার ভগ্নাংশও পূরণ করা গেল না। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের অবনী, হায়দরাবাদের শম্মু খান, এলাহাবাদের রামরতন কি পানজিমের অ্যালেক ডি সা-কে কি আমরা বাঁচাতে পারলাম?

'আলিপুর জেলের অবনী' মানে? কথাটা জেলখানার পাগলা ঘন্টির মতো বাজলে লাগল অনির্বাণের মাথার ভিতরে। খবরের কাগজে তো কোনো খবর ছিল না ওর ফাঁসির। এত চাঞ্চল্যকর ঘটনার এরকম নীরব পরিণতি কেন?

অনির্বাণ জিজ্ঞেস করল, অবনীকে কি হ্যাং করা হয়ে গেছে? কাগজে তো কিছু দেখিনি।

সত্যশিব চেকটা অনির্বাণকে ফেরত দিতে দিতে বললেন, যদি তেমন মনে কর তো চেকটা ভাঙিয়ে টাকাটা অবনীর বাপ-মা–বোনদের পাঠিয়ে দিতে পারো। দু-সপ্তাহ হল অবনী সলিটারি জেলে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে। মৃত্যুর আগে একটা ছোট্ট নোট লিখেছিল আমার নামে। আমি সেটা নিতেই কলকাতা এসেছি।

অনির্বাণের উৎকণ্ঠা আর বাঁধ মানছে না। একটা বাক্যেই যেন নিষ্পত্তি হয়ে যাবে ভগবান আছেন কি নেই, ভূত সত্যি না মিথ্যে। ও বলল, আপনি নোটটা কালেক্ট করেছেন?

সত্যশিব বললেন, হ্যাঁ।

–কী লিখেছে তাতে?

–লিখেছে 'আমি খুন করিনি। তাই ফাঁসিতে মরতে হল না। এখন আপনি বিশ্বাস করলেই আমার শান্তি।'

—আপনি বিশ্বাস করলেন?

—এই বিশ্বাস করা, না-করা দুটোই অমূলক আমার কাছে। আমি কোনোটাই চাই না।